সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক
বেলা দাস
বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

একুশশতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রসঙ্গ কবিকঙ্কণচণ্ডী

মোহিনীমোহন সরদার

বিচিত্র জীবন, আশ্চর্য প্রতিভা, অনন্য সাধারণ প্রকাশক্ষমতা, বিস্ময়কর সৃষ্টি রহস্যের অধিকারী রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও জীবন উভয়ই গতানুগতিকের বহু উর্দ্ধে, দুই-ই অলোকসামান্য। যদি তাঁর কাব্য প্রতিভার উপরই আলোকপাত করা যায়, তবে আমরা দেখি তিনি যুগপৎ স্রষ্টা ও নিরীক্ষক, কবি ও সমালোচক, লেখক ও পাঠক। তাঁর পঠন অভিজ্ঞতা যেমন বহুমুখী, বিচিত্র, তেমনি কেন্দ্রানুগ, অন্তর্মুখী। শৈশব, বাল্য ও কৈশোরে দ্বিবিধ উপায়ে মাতৃভাষার প্রাচীন সাহিত্য ঐতিহ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানসিক সংযোগ তৈরি হয়েছিল। প্রথমটি শ্রবণ দ্বিতীয়টি পঠন। ছড়া, রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, পাঁচালি ইত্যাদি শোনার ব্যাপারে শিশু রবীন্দ্রনাথের সহায়ক হয়েছিল পরিবার পরিজন, বাড়ির বুড়িদাসি, ঝি, চাকর, সেরেস্তার কর্মচারী প্রমুখেরা। ছেলেভুলোনো ছড়া তাঁর কাছে ছিল 'শৈশবের মেঘদূত'। প্রাগাধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে জীবনের প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথের এই নিবিড় সংযোগ তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থের 'বাংলা শিক্ষার অবসান' অধ্যায়ে তিনি স্বীকার করেছিলেন—

> 'ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটার চালনা সম্ভব হইয়াছিল।..... প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার সুযোগ না পাইলে মনের চলৎশক্তিতেই মন্দা পড়িয়া যায়। যখন চারিদিকে খুব কষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।'[১]

'সাধনা' (আষাঢ়, ১৩০০ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্রসঙ্গকথা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন—

> 'মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পন্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কি নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই।'[২]

১৬ই কার্তিক ১৩২৮ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—

'বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরী করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে।'[৩]

রবীন্দ্রনাথের এই সমস্ত স্বীকারোক্তি থেকেই প্রাগাধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও গভীর চর্চার ইতিহাসটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে কবিগান, টপ্পা, পাঁচালি প্রভৃতি প্রাগাধুনিক সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় তিনি পদচারণা করেছেন স্বচ্ছন্দে। কৌতূহলী ছাত্রের মতো পাঠ করেছেন পুথি, মুদ্রিত গ্রন্থ, বিদগ্ধ সমালোচকের মতো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন গ্রন্থপাঠের।[৪] গ্রন্থপৃষ্ঠার মার্জিনে টিকা-টিপ্পনী[৫] লিখেছেন, মন্তব্য করেছেন শব্দ চয়ন ও শব্দ ব্যবহার[৬] নিয়ে, এইসব তথ্য আমাদের কাছে আজ আর অবিদিত নেই। কেবল মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে তাঁর পঠনগত অভিজ্ঞতা কত অন্তর্ভেদী ছিল, আমার আলোকপাত সেইটুকুর উপরে।

কবিকঙ্কণচণ্ডী বিষয়ক রবীন্দ্র আলোচনাটিকে আমি দুটি ভাগে উপস্থাপন করব। প্রথমটি মুকুন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধের পাঠ জনিত মন্তব্য[৭] ও তৎকালীন মুকুন্দ ভক্তদের প্রতিক্রিয়া যা মূলত ঐতিহাসিক আর দ্বিতীয়টি মুকুন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ তেষট্টি বছরের চর্চা[৮], লেখালেখি, যা মূলত সাহিত্যিক। অর্থাৎ প্রথমটির মূল্য ইতিহাসের দিক থেকে আর দ্বিতীয়টির মূল্য নান্দনিকতার দিক থেকে।

১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে) অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত, চুঁচুড়া, সাধারণী যন্ত্রে, নন্দলাল বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ৮০০ পৃষ্ঠার[৯] অখণ্ড 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থ পাঠ দিয়েই রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডীমঙ্গল' চর্চার সূত্রপাত। ওই ১৭ বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী গ্রন্থ পাঠ করে গ্রন্থপৃষ্ঠার মার্জিনে বিভিন্ন মন্তব্য লিখেছিলেন[১০], ঠিক যেমনটি চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাওয়া ১৩১৩ সালের বঙ্গবাসী সংস্করণ পাঠে করেছিলেন[১১] তিনি। এরপর দীর্ঘদিন (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত) কখনও কালিপ্রসন্ন ঘোষ[১২], বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়[১৩], অক্ষয়চন্দ্র সরকার[১৪], অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী[১৫] প্রমুখের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী প্রসঙ্গ ও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত উচ্ছ্বাসের বিরোধিতা করে, কখনও দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের আলোচনা[১৬] করতে গিয়ে, কখনও সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত লেখালেখির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে[১৭], আবার কখনও বা কালান্তরের রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্লেষণ সূত্রে[১৮], এমনকি কথা প্রসঙ্গেও[১৯] রবীন্দ্রনাথ বহুবার মুকুন্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কোথাও 'মেয়েদেবতার'[২০] শক্তির লীলা খেলা, কোথাও বা চরিত্র সৃষ্টি[২১] প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত ৮০০ পৃষ্ঠার[২২] 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর প্রতিক্রিয়া[২৩] জানিয়েছিলেন তা 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' (সংখ্যা-২৪৬) দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির শেষের ছয়টি পৃষ্ঠায় 'সন্দেহস্থল'[২৪] শিরোনামে লিখিত আছে। শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থ পাঠ করেই রবীন্দ্রনাথ প্রথমবর্ষ, 'হিতবাদী পত্রিকায়' মুকুন্দ চক্রবর্তী ও তাঁর কাব্যের উপর একটি আলোচনা[২৫]ও লিখেছিলেন, যে লেখাটির কথা চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে' স্বীকার করেছেন। ইউরোপীয় সাহিত্যতত্ত্বের ধারণা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তখন সদ্য বিলেত থেকে ফিরেছেন।[২৭] দেশে ফিরে 'ভারতী পত্রিকায়'[২৮] প্রকাশিত অভয়চন্দ্র চৌধুরীর 'বঙ্গসাহিত্য'[২৯] প্রবন্ধটি

পাঠ করে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং ঘটনাচক্রে ওই বছরই[৩০] অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'[৩১] গ্রন্থটি তিনি খুব খুঁটিয়ে পাঠ করার সুযোগ পান। ফলত অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনামূলক লেখাগুলিতে মুকুন্দ প্রতিভা স্থান পেতে থাকে। এখানে বলে নেওয়া ভালো যে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এই সময়টিতে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট রীতি পদ্ধতি গড়ে ওঠেনি। কালিপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি'[৩২] এবং সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালী কবি কেন'[৩৩] প্রবন্ধ দুটির সমালোচনার সূত্রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ভারতী পত্রিকায়[৩৪] পর পর দুটি প্রবন্ধ লেখেন 'বাঙ্গালী কবি নয়'[৩৫] এবং 'বাঙ্গালী কবি নয় কেন।'[৩৬] প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাথ কালিপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি'র তত্ত্বকে যেমন স্বীকার করেননি, তেমনি 'বঙ্গদর্শন'[৩৭] পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির বক্তব্য:

> 'অশিক্ষিতের উপর কল্পনার একাধিপত্য, বাঙ্গালী অশিক্ষিত, অপরিকল্পিত বুদ্ধি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সুতরাং বাঙ্গালীর কল্পনাও প্রবল, সুতরাং বাঙ্গালী কবি'

এই অভিমতও বাতিল করে দেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থিত করেন 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' কাব্যটিকে।

মনে রাখতে হবে, উনিশ শতকের এই সময়টি মুকুন্দ পূজার কাল। বঙ্কিমচন্দ্র[৩৮] থেকে শুরু করে রমেশচন্দ্র[৩৯] ও দুই অক্ষয়চন্দ্র[৪০] সকলেই মুকুন্দের এতটাই অন্ধভক্ত[৪১] যে, সমকালীন মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমুখ আধুনিক কবিদের উপরেও তাঁকে স্থান করে দিতে তাঁরা দ্বিধা করেননি। এই অন্ধ মুকুন্দ প্রশস্তির বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী কাব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন 'বাঙ্গালী কবি নয়'[৪২] প্রবন্ধে। বাঙালির কবিত্ব প্রতিভার দুর্বলতা দেখাতে গিয়ে তিনি কবিকঙ্কণের 'কমলেকামিনী' প্রসঙ্গে মুকুন্দের সৌন্দর্য কল্পনার অভাব ও সামঞ্জস্য হীনতার কথা তুললেন। তীব্রভাবে আক্রমণ করে বললেন—

> 'কবিকঙ্কণের কমলেকামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তী গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়। শিক্ষিত সংযত মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোনো মতেই একত্র উদয় হইতে পারে না।'[৪৩]

প্রবন্ধের পাদটীকায় মুকুন্দ ভক্তদের কমলেকামিনী সম্পর্কিত সম্ভাবিত কৈফিয়তগুলিকে খণ্ডন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আক্রমণকে আরো তীব্রতর করে তুললেন। যাঁরা এই চিত্রটিকে অদ্ভুত রসের সার্থক প্রকাশ বলে সমর্থন করেছিলেন। তাঁদের মতের প্রতিবাদ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

> 'সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্বপূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমনকি আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে।'[৪৪]

গঙ্গাচরণ সরকার তাঁর 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে বক্তৃতা'[৪৫] গ্রন্থে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্পর্কে প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

> 'এই গ্রন্থ (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী) বঙ্গভাষার প্রকৃত আদিকাব্য।....ইহা গ্রন্থকারের কল্পনাসম্ভূত একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর সুপ্রশস্ত মহাকাব্য।'[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাচরণ সরকারের এই কথার প্রতিবাদ করে লিখলেন—

'কবিকঙ্কণের দেব-দেবীরাও নিতান্ত মানুষ। কেবলমাত্র মানুষ নহে, কবিকঙ্কণের সময়কার বাঙ্গালী। হর-গৌরীর বিবাহ, মেনকার খেদ, নারীগণের পতিনিন্দা, হর-গৌরীর কলহ পড়িয়া দেখ দেখি। কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তন বৃহৎ হইলেই কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। বিদ্যাসুন্দর যতলোকে পড়িয়াছে, ততলোকে কি শ্রেষ্ঠতর কাব্য কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছে।'[৪৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বক্তব্যে গঙ্গাচরণ সরকারের বলা 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী মহাকাব্য'[৪৮] এই তথ্যটিকে যেমন বাতিল করলেন, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালী কবি কেন' প্রবন্ধটিতে ব্যক্ত 'বাঙ্গালী কবির তত্ত্ব'[৪৯] টিকেও নস্যাৎ করলেন তিনি। বললেন—

'কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরস কাব্য। কিন্তু উহা লইয়া আমরা বাঙ্গালী জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না।'[৫০]

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী কাব্যের মধ্যে মহাকাব্যিক বৈশিষ্ট্য খুঁজতে গিয়ে তার যে বিরূপ সমালোচনা তিনি করলেন, সেই সমালোচনার মধ্যে দিয়েই কিন্তু প্রকাশ পেয়ে গেল মুকুন্দের বাঙালিয়ানা, কথা সাহিত্যিক সুলভ তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তি, তাঁর সরস কৌতুক প্রবণতা, এককথায় মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারার সপ্রশংস গুণগুলি। রবীন্দ্রনাথ স্বীকারই করলেন, ভারতচন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কাব্য মুকুন্দের কবিকঙ্কণ-চণ্ডী। তরুণ রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করার উগ্র ঝাঁঝে বুঝতেই পারলেন না যে আসলে মুকুন্দের গুণগুলিই তিনি আবিষ্কার করে দিলেন। লিখলেন—

'কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরল কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙালীরাও এ কাব্য লইয়া গর্ব করিতে পারে।.... তখনকার বঙ্গবাসীর গৃহ অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে, জমিদারের কাছারীতে, চাষার ভাঙ্গা কুঁড়েতে, মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে। কোথায় ব্যাধের মেয়ে—

'মাংস বেচি লয় কড়ি   চাল নয় ডালি বড়ি
শাক্ বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।'

কোথায় চাষার 'ভাঙ্গা কুঁড়িয়া তালপাতার ছাউনি' আছে, যেখানে 'অল্প বৃষ্টি হইলে কুড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ'। কোথায় গাঁয়ের মণ্ডল ভাঁড়ু দত্ত হাটে আসিয়াছে—

'পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি,
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।'

তাহা সমস্ত তিনি ভালো করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই হাট-মাঠেই কি কল্পনার বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট? কল্পনার ইহা অপেক্ষা উপযুক্ততর ক্রীড়াস্থল আছে।'[৫১]

তাঁর এই আলোচনায় সেকালের মুকুন্দ ভক্তগণ ক্ষুব্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে আক্রমণ করতেই রবীন্দ্রনাথ সেই আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করলেন। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে মুকুন্দের কাব্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে সমকালীন মুকুন্দ ভক্তদের বিরোধিতা করলেন তিনি। ফলে রবীন্দ্রনাথ মুকুন্দ বিরোধী ছিলেন, এই অভিমত সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল। এখানে আমরা একথা স্বীকার করতেই

পারি যে, রবীন্দ্রনাথের এই মুকুন্দ বিরোধিতা আসলে সমকালীন অন্ধ মুকুন্দ পূজকদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফল। সাহিত্য সমালোচনার এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অবশেষে নিজের বক্তব্য থেকে পিছু হঠলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধের বিস্ফোরক মন্তব্য বর্জন করে তাঁর বক্তব্যকে অনেক সহনীয় ও নমনীয় করে প্রকাশ করলেন 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি' (সমালোচনা, ১২৯৪) নামের প্রবন্ধটি। কিন্তু 'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধে কি এমন বললেন রবীন্দ্রনাথ যা তাঁকে মুকুন্দ বিরোধী আখ্যা দিল। বিশেষজ্ঞ উদ্ধার করেছেন রবীন্দ্রনাথের সেই সমস্ত বক্তব্য :

> '...ইহাতে কেহ না মনে করেন আমি কবিকঙ্কণকে কবি বলি না। যে বিষয়ে তাহার শিক্ষার অভাব ছিল, সেই বিষয়ে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছে, এইমাত্র। পরিমাণ-সামঞ্জস্য, যাহা সৌন্দর্যের সার, সে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি।......
>
> 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে মহাকাব্যই নাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকে কি মহাকাব্য বল? তাহাকে উপাখ্যান বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহা কি মহাকাব্য? কালকেতু নামে এক দুঃখী ব্যাধ কোনো দিন বা খাইতে পায়, কোনো দিন বা খাইতে পায় না। যে দিন খাইতে পায়, সে দিন সে চারি হাঁড়ি ক্ষুদ, ছয় হাঁড়ি দাল ও ঝুড়ি দুই-তিন আলু ওল পোড়া খায়। 'ছোট গ্রাস তোলে যেন তে আঁটিয়া তাল'। 'ভোজন করিতে গলা ডাকে হড় হড়।' এই ব্যক্তি চণ্ডীর প্রসাদে রাজত্ব পায় কিন্তু তাহার রাজসভায় ও একটি ছোট খাটো জমিদারী কাছারীতে প্রভেদ কিছুই নাই। তাহার রাজত্বে 'হানিফ গোপ' ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করে, ভাঁড়ু দত্ত বলিয়া এক মোড়ল আসিয়াছে, তাহার—
>
> 'ফোটা কাটা মহাদন্ত, ছেঁড়া যোড়া কোঁচালম্ব
> শ্রবণে কলম খরশান।'
>
> ধনপতি নামে এক সদাগর আছে, সোনার পিঞ্জর গড়াইতে সে ব্যক্তি গৌড় দেশে যায়, তাহার দুই পত্নী ঘরে বসিয়া চুলাচুলি করে। দুর্বলা বলিয়া তাহারে এক দাসী আছে, সে উভয়ের কাছে উভয়ের নিন্দা করে ও দুই পক্ষেই আদর পায়। সমস্ত কাব্যই এইরূপ।'[২২]

রবীন্দ্রনাথের বর্জন করা এই দীর্ঘ বক্তব্য উদ্ধার করা হল এই কারণেই যে, উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে একথা প্রমাণিত হবে যে রবীন্দ্রনাথ ততটা মুকুন্দ বিরোধী ছিলেন না, যতটা সমকালীন মুকুন্দ পূজকদের বিরোধী ছিলেন। কারণ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের সেই সমস্ত আলোচনার অধিকাংশই একালের দৃষ্টিতে এবং সাহিত্য তত্ত্বের বিচারে নিরপেক্ষ ও সংগত বলে মনে হয়, তবে সেকালে মুকুন্দ বিরোধী আলোচনা বলে সাহিত্য সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যগুলি কম ঝড় তোলেনি। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী সম্পর্কিত এই তিক্ত ঘটনা আজীবন মনে রেখেছিলেন কবি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে Edward Thompson-এর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে পুনর্বার সে কথা স্মরণ করেছিলেন কবি :

> কবিকঙ্কণের রচনার মধ্যে জীবনের যে আদর্শকে আপনি দেখতে পাবেন তা অত্যন্ত স্থূল। আমি যখন খুবই তরুণ তখন কবিকঙ্কণের উপর আমি একটি

সমালোচনা লিখেছিলাম, তা সাধারণকে খুবই ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল এবং আমি তাঁদের কাছ থেকে নিন্দার শাস্তি লাভ করেছিলাম। তাঁরা তখন ভেবেছিলেন যে যেহেতু আমি একজন ব্রাহ্ম তাই আমি ঐসব বিস্ময়কর বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম। কিন্তু তাঁরা জানতেন না, প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে আমি ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের কেউ নই। কবিকঙ্কণের কথায় ফিরে গিয়ে বলতে চাই যে তৎকালীন মানুষেরা এর মধ্যে যেটা প্রবলভাবে অনুভব করে ছিল তা হল ক্ষমতার অত্যাচারের কাছে তাদের একান্ত অসহায়তা এবং নিয়তির লীলা। শক্তিদেবী কলিঙ্গারাজকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর প্রিয় পাত্রকে রাজ্যদানের জন্য সবরকমের নীচ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এটাতে সেদিনকার মানুষ আনন্দ পেয়েছিল। এইভাবে তাদের সেদিন এই খামখেয়ালী দেবীকে তুষ্ট করার সুযোগ ঘটেছিল। আজকের রাজনীতিতেও এই চেষ্টাটি বিলক্ষণ লাভ করা যায়। যেহেতু কবিকঙ্কণ ছিলেন দরিদ্র এবং নিপীড়ত তাই তিনি ক্ষমতার স্বপ্ন দেখেছিলেন।'[৫৩]

'বাঙ্গালী কবি নয়' প্রবন্ধ লেখার ছ'বছর পরে 'ভারতী ও বালক' (চৈত্র, ১২৯৩) পত্রিকায় প্রকাশিত 'কাব্য ঃ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধে মুকুন্দ ভক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'কাব্যি সমালোচনা' (নবজীবন, অগ্রহায়ণ, ১২৯৩) নামের একটি লেখার প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ তীব্র সমালোচনা করেন মুকুন্দের। স্পষ্ট ও বস্তুগত কবিতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকার কবিকঙ্কণের দুঃখ-দারিদ্র্য বর্ণনার প্রশংসা করে লিখেছিলেন—

'কবিকঙ্কণের দারিদ্র দুঃখ বর্ণনা যে কখনো দুঃখের মুখ দেখে নাই, তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়—

দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান।.....

'যে আমানি খাইয়া মধ্যে মধ্যে দিন কাটায়, সে অত কথা বলিবে কেন? সে বলিল, আমাদের দুঃখ বুঝিবে ত ঐ আমানি খাবার গর্ত দেখ।

'দারিদ্র্যের কি কঠোর অভিব্যক্তি! কথা কয়টা বুকের ভিতর বসিয়া যায়। ভাঙ্গা ঘরের গর্ত কয়টা বিলাসীগণের জটে ধরিয়া তাহাদিগকে নাড়া দিতে থাকে। আবার বলি ইহাই সার্থক কবিত্ব, সার্থক কল্পনা, সার্থক প্রতিভা।'[৫৪]

এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য উদ্ধৃত করে লিখলেন—

'পড়িয়া সহসা মনে হয়, এ কথাগুলো হয় গোঁড়ামি, না হয় তর্কের মুখে বলা অত্যুক্তি,.... আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্য নৈপুণ্য থাকিতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র কবিত্বে সিক্ত হইয়া ওঠে নাই, ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয়, তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে', সে তো আরো কবিত্ব।'[৫৫]

এইখানেই রবীন্দ্রনাথ থামলেন না। অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যকে একসঙ্গে আক্রমণ করে তিনি আরো লিখলেন—

'ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাঁহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর কোনো নাম দিন। যিনি ভঙ্গী করিয়া কথা কহেন তিনি না হয় ইহাকে কাব্যু বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারো হাসি পাইতে পারে।'[৫৬]

চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে মুকুন্দের কবিত্ব ও বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত পরবর্তীকালেও বজায় ছিল। 'ফুল্লরার বারমাস্যা'য় বর্ণিত কালকেতুর পরিবারের দারিদ্র্য দুঃখ বর্ণনা আসলে যে ফুল্লরার বানানো অতিশয়োক্তি, সেকালের মুকুন্দ ভক্তরা তা বুঝতে পারেননি। ফলত রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ মুকুন্দের প্রতি ততটা নয়, যতটা সেই ভক্তদের প্রতি। দীর্ঘদিন পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৩৫) 'সাহিত্যের রূপ' প্রবন্ধে বিষয়টির অবতারণা করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব সিন্ধান্তেই অবিচল ছিলেন।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি মুকুন্দ বিরোধী ছিলেন। কেহ কেহ সেকথা জোরের সঙ্গে বলেওছেন। কিন্তু তিনি যে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী কাব্যের নিরপেক্ষ সমালোচক ছিলেন, তাও চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কোনো কোনো মুকুন্দ বিশেষজ্ঞ। আর রবীন্দ্রনাথ যদি মুকুন্দ বিরোধী হবেন, তাহলে অর্ধ-শতাধিক কাল ধরে সে কবিকে বার বার স্মরণ করে নিজের লেখায় টেনে আনবেন কেন? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলির যথাযথ সমালোচনা তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের 'সাধনা' পত্রিকায় 'নর-নারী'[৫৭] প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

> 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থানুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোনো কাজেই নহে।'[৫৮]

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী কাব্যে সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা, সমাজতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটটি রবীন্দ্রনাথের প্রধান বিচার্য হয়েছিল দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (২য় সংস্করণ) গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে। 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩০৯) প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধে তিনি দেখালেন এক 'আধ্যাত্মিক অরাজকতার' মধ্যে খামখেয়ালি 'মেয়ে দেবতা' চণ্ডীর শক্তির লীলা। পরাজিত হয় 'শিবশক্তি'। পরবর্তীকালে প্রবাসী পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩২৬) 'বাতায়নিকের পত্র' এবং 'শক্তিপূজা' (কার্তিক ১৩২৬) প্রবন্ধ দুটিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপে শক্তির মদমত্ততাকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করলেন 'চণ্ডী'র খামখেয়ালি শক্তির লীলার সঙ্গে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

অপরপক্ষে বারবার মুকুন্দ প্রতিভার প্রশংসা করলেন রবীন্দ্রনাথ ভাঁড়ু দত্ত চরিত্র সৃষ্টির চূড়ান্ত শৈল্পিক দক্ষতার কারণে। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' (বৈশাখ ১৩১৪) প্রবন্ধে তিনি লিখলেন—

> 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ু দত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নহে, এইরকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটা কৌতুক রস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদের হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের

মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক, কবি তাহার চেয়ে বেশি কিছু দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারে ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ঐটুকু মাত্র নয়। এই জন্যই সে আমাদের কাছে এমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোনো একটা সমগ্রভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।'[৫৯]

আমরা যদি মুকুন্দের কাব্যের অন্যান্য আলোচনার কথা বাদও দিই, এই একটি মাত্র চরিত্রের সৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন কবি। প্রয়াণের কয়েক মাস পূর্বেও এই চরিত্রটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চূড়ান্ত মত জানিয়েছেন প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত 'সাহিত্যের মূল্য' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮) প্রবন্ধে :

> 'কবিকঙ্কণের সমস্ত কাব্য রাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে কিন্তু রইল তাঁর ভাঁড়ুদত্ত।'[৬০]

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য

১. দ্রষ্টব্য : 'জীবনস্মৃতি', 'বাংলা শিক্ষার অবসান', র. র. প. ব. স. সংস্করণ (দশম খণ্ড), পৃ. ৩০-৩১।

২. দ্রষ্টব্য : 'প্রসঙ্গকথা', সাধনা, আষাঢ় ১৩০০, পৃ. ১৯৬।

৩. দ্রষ্টব্য : ব্রজেননাথ শীলকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ১৬ কার্তিক, ১৩২৮।

৪. 'মঙ্গলকাব্য', 'বৈষ্ণব পদাবলী' প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে পাঠ- প্রতিক্রিয়া এখানে সেটিই নির্দেশ করা হচ্ছে।

৫. 'বৈষ্ণব পদাবলী', 'চণ্ডীমঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠের ফলস্বরূপ রবীন্দ্র-মন্তব্য ও টিকা-টিপ্পনীর কথাও এখানে দ্রষ্টব্য।

৬. দ্রষ্টব্য : 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির শেষের ছয়টি পৃষ্ঠায় 'সন্দেহস্থল' শিরোনামে লিখিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া ও মন্তব্য।

৭. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, গঙ্গাচরণ সরকার প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ ও রবীন্দ্র প্রতিক্রিয়ার কথাই এখানে বিবেচ্য।

৮. ১২৮৫-১৩৪৮ বঙ্গাব্দে পর্যন্ত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখালেখি, মন্তব্য ইত্যাদির কথাই এখানে বিবেচ্য।

৯. অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থটি ছাড়া, উনবিংশ এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও ৮০০+ পৃষ্ঠায় 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র অন্য কোনো মূলগ্রন্থ আমাদের নজরে আসেনি, যে কারণে এই গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখের দাবিদার বলে আমাদের মনে হয়।

১০. দ্রষ্টব্য : 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি' গ্রন্থের 'সন্দেহস্থল' শিরোনামের পেছনের ছয়টি পৃষ্ঠা, যেখানে শব্দ, চরণ ও পৃষ্ঠার সংখ্যা ধরে ধরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠ- প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

১১. এই গ্রন্থটির মার্জিনে যে মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন, সেই মন্তব্যস্থল মূল গ্রন্থটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সম্বলিত' শিরোনামে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১২. দ্রষ্টব্য : কালিপ্রসন্ন ঘোষ, 'নীরব কবি', বান্দব, মাঘ, ১২৮১, প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্র প্রতিক্রিয়া।

১৩. সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বাঙ্গালী কবি কেন' বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮২ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পাঠ-প্রতিক্রিয়া দ্রষ্টব্য।

১৪. অগ্রহায়ণ, ১২৯৩, 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ 'কাব্যি সমালোচনার জবাবে বলা রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট', ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৩ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য, সাহিত্য, র. র. (১৩ খণ্ড), প. ব. স. পৃ. ৮২৫।

১৫. কার্তিক ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন এখানে সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ করা হচ্ছে।

১৬. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' শ্রাবণ ১৩০৯, সাহিত্য, র.র. (১৩ খণ্ড) প. ব. স. পৃ. ৮১২-৮১৪, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

১৭. 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য', 'সাহিত্যের রূপ', 'সাহিত্যের মূল্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮. 'বাতায়নিকের পত্র' 'শক্তিপূজা'—কালান্তর র. র. (১৩ খণ্ড), প. ব. স. দ্রষ্টব্য।

১৯. ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে Edward Thompson-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন কবি, তাতে মুকুন্দ প্রসঙ্গটি ছিল, এই জাতীয় আলোচনার কথাই এখানে উল্লেখ্য।

২০. দ্রষ্টব্য 'বাতায়নিকের পত্র,' 'শক্তিপূজা' প্রভৃতি প্রবন্ধ।

২১. দ্রষ্টব্য 'নর-নারী', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য', 'সাহিত্যের মূল্য'—প্রভৃতি প্রবন্ধে বর্ণিত চরিত্র বিষয়ক রবীন্দ্র আলোচনা।

২২. আমরা আগেই স্বীকার করেছি উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে ৮০০ পৃষ্ঠার অখণ্ড (মূলগ্রন্থ) 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র সম্পাদনা একমাত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকারই করেছিলেন, যে গ্রন্থটি প্রথম পাঠ করে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

২৩. যেমন অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত গ্রন্থের ১ম পৃষ্ঠায় 'গণেশ বন্দনা' অংশে আছে—

'অঙ্গের বন্দুক ছটা আজানু লম্বিত জটা
শশিকলা মুকুট মণ্ডল।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—গণেশের জটা আছে কি? এইরূপ বিভিন্ন পাঠ প্রতিক্রিয়া ও রবীন্দ্র মন্তব্যের কথাই এখানে উল্লেখ্য।

২৪. এই অংশটির মূল পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা সহ সম্পূর্ণ নোটটির বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করেছেন বিশ্বনাথ রায় তাঁর 'রবীন্দ্র ভাবনায় কবিকঙ্কণ-মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল' প্রবন্ধে। দ্রষ্টব্য আশিস কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত, 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল আলোচনা ও পর্যালোচনা', পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬, পৃ. ৪২১-৪২৬।

২৫. এই আলোচনাটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি, তবে এর উল্লেখ আছে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' সম্পর্কে পূর্বালোচনার তালিকায়। সেখানে বলা আছে—'হিতবাদী' (১ম বর্ষ)—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২৬. খণ্ডটি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২৭. প্রায় দেড় বৎসর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে এবং হেনরি মরলির শিক্ষার প্রভাবে ইংরাজি

সাহিত্য জগতে গভীরভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ কবির। 'জীবনস্মৃতির', 'ভগ্নহৃদয়' অধ্যায়ে তিনি স্বীকার করেছেন—'তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য দেবতা ছিলেন শেক্‌সপীয়র, মিল্টন ও বায়রণ। ইহাদের লেখার ভিতরকার যে জিনিষটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে, সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা।'

২৮. কার্তিক, ১২৮৫।

২৯. দ্রষ্টব্য ভারতী, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১২৮৫, লেখক চ (অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী)।

৩০. ১২৮৫ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

৩১. গ্রন্থটি নামপত্রটি এইরূপ—
কবিকঙ্কণ-চণ্ডী/ শ্রী মুকুন্দরাম চক্রবর্তী/ প্রণীত।/ শ্রী অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক/ সম্পাদিত/। চুঁচুড়া/ সাধারণী যন্ত্রে শ্রী নন্দলাল বসু কর্তৃকশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/ ১২৮৫।/ মূল্য—৪টাকা।/

৩২. বান্দব, মাঘ, ১২৮১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

৩৩. বঙ্গাদর্শন, পৌষ, ১২৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।

৩৪. ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩৫. ভারতী, ভাদ্র—১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

৩৬. ভারতী, আশ্বিন—১২৮৭ বঙ্গাব্দ।

৩৭. বঙ্গাদর্শন, পৌষ, ১২৮২। প্রবন্ধটি সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রই লিখেছিলেন।

৩৮. 'Bengali literature', Calcutta Review, ১৮৭১ ও 'বাঙ্গালা ভাষা', 'বঙ্গাদর্শন', ৩য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৮৭২ লেখা দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্র মুকুন্দ চক্রবর্তীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

৩৯. 'The literature of Bengal', I.C. Bose Co. Stanhope Press, 1877 গ্রন্থে এবং 'মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মাঘ ১৩০১ প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত মুকুন্দ সম্পর্কে বহু তথ্য যেমন উদ্ধার করেছিলেন, তেমনি ভারতচন্দ্র যে মুকুন্দের কাছে ঋণী একথাও তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন।

৪০. দুই অক্ষয়চন্দ্র বলতে, 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ', 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', 'সত্যপীরের পাঁচালী' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক, 'বঙ্গাসাহিত্য' ভারতী, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক ১২৮৫ প্রবন্ধের লেখক অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর কথাই এখানে বিবেচ্য।

৪১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর প্রশংসার পর থেকে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রামগতিন্যায়রত্ন থেকে শুরু করে গঙ্গাচরণ সরকার পর্যন্ত একাধিক সমালোচক মুকুন্দের প্রতিভার বিশেষ দিকগুলি এতটাই বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন যে, মুকুন্দের দোষগুলির কথা তাঁরা বিবেচনার মধ্যেই রাখলেন না—এই মুকুন্দ প্রশস্তিকে আমরা 'অন্ধ মুকুন্দপূজা' এবং পূজক যাঁরা তাঁদেরকে 'অন্ধভক্ত' বলে চিহ্নিত করতে চাইছি।

৪২. ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৭, পৃ. ২১৯-২২৯ দ্রষ্টব্য।

৪৩. দ্রষ্টব্য : 'বাঙ্গালী কবি নয়', ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭, পৃ.২২৩-২২৪।

৪৪. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ২২৪ দ্রষ্টব্য।

৪৫. নন্দলাল বসু, সাধারণী যন্ত্র, চুঁচুড়া, ১৮৮০ দ্রষ্টব্য।

৪৬. পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ২৮ দ্রষ্টব্য।

৪৭. দ্রষ্টব্য : 'বাঙ্গালী কবি নয়', ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭, পৃ. ২২৭-২২৮।

৪৮. দ্রষ্টব্য গঙ্গাচরণ সরকার, 'বঙ্গাসাহিত্য ও বঙ্গাভাষা বিষয়ে বক্তৃতা' গ্রন্থ, নন্দলাল বসু, সাধারণী যন্ত্র, চুঁচুড়া, ১৮৮০, পৃ. ২৮।

৪৯. দ্রষ্টব্য : 'বাঙ্গালী কবি কেন', বঙ্গাদর্শন, পৌষ ১২৮২।

৫০. দ্রষ্টব্য : 'বাঙ্গালী কবি নয়', ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭, পৃ. ২২৯।

৫১. দ্রষ্টব্য : পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ২২৮-২২৯।

৫২. দ্রষ্টব্য : পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ২২৪-২২৫।

৫৩. দ্রষ্টব্য : Edward Thompson—Rabindranath Tagore, Riddhi, Ed, 1979, পৃ. ৪৮, ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাংলা অনুবাদ।

৫৪. দ্রষ্টব্য : 'কাব্যি সমালোচনা', নবজীবন, তৃতীয় ভাগ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পৃ. ৩১৫।

৫৫. দ্রষ্টব্য : 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট', সাহিত্য, ১৯৭৪ মুদ্রণ, পৃ. ১৭২।

৫৬. দ্রষ্টব্য : পূর্বোল্লিখিত সূত্র, পৃ. ১৭২।

৫৭. পরে প্রবন্ধটি 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫৮. দ্রষ্টব্য : 'পঞ্চভূত', (১৩০৪) গ্রন্থের 'নর-নারী' প্রবন্ধ।

৫৯. দ্রষ্টব্য : 'সাহিত্য' (১৩১৪) গ্রন্থের 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' প্রবন্ধ।

৬০. দ্রষ্টব্য : 'সাহিত্যের মূল্য', ১৩৪৮, 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থ।